শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে সহজ

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

ফাওজুল কাবীর

শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে

সহজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা

ফাওজুল কাবীর

www.pedasearch.com
www.facebook.com/pedasearch
www.youtube.com/@pedasearch

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

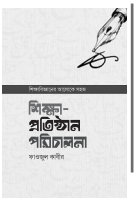

শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে
সহজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা
মূল : ফাওজুল কাবীর
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২৪
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও সজ্জা
সাহিত্যসারথি
প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৬৮-৮৬৪৪২৮
অফিস : বাড়ি ৩১৩/১৭/১২, উত্তর সানারপাড়,
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
০১৭৮৯৮৫৪৬০২
অনলাইন পরিবেশক
Rokomari - Wafilife
আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৭৫৩২-৬-১

মুদ্রিত মূল্য
২৬০৳

উৎসর্গ

যারা আমার অস্তিত্বের কারণ
সেই প্রিয় মা-বাবার প্রতি।

প্রকাশকের আরজ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। ছোটবেলা থেকেই আমরা এই কথাটি পড়ে ও শুনে আসছি। কিন্তু সম্ভবত খুব কম মানুষই আছেন, যারা এই ছোট্ট বাক্যটির গভীর মর্ম ও আবেদনকে উপলব্ধি পেরেছেন বা পারেন। সাধারণ মানুষের কথা বাদই দিলাম, শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নানাভাবে জড়িত অনেক মানুষের মধ্যেও এই উপলব্ধির ছিটেফোঁটা খুজে পাওয়া মুশকিল এখন। অধিকাংশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, জাতির মেরুদণ্ড গড়তে নয়, বরং ভাঙতেই তারা সদা তৎপর। ফলে বিশ্ব যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, আমরা যেন সে গতিতেই পিছিয়ে পড়ছি।

একটা জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাদের শিশুরা। কারণ শিশুদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জাতির ভবিষ্যৎ-মানচিত্র। আর এই লুকানো ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল অবয়বে উদ্ভাসিত করতে পারেন কেবলই একজন শিক্ষক। শিশুরা নরম কাদামাটির মতো। দক্ষ কুমোরের নিপুণ হাতে যেভাবে নরম কাদামাটি থেকে তৈরি হয় চোখজুড়ানো তৈজসপত্র, অনুরূপ একজন অভিজ্ঞ ও দরদি শিক্ষকের মায়াবী ছোঁয়ায় ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে একজন শিশু। ফলে জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ শিশুদের মাধ্যমে সেই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্বটা শিক্ষকশ্রেণি এবং শিক্ষাব্যবস্থার ওপরেই বর্তায়।

এদিক থেকে শিক্ষাকে বলা যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, আর শিক্ষকরা হলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান শিল্পী। তারা জাতি ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের কারিগর। যেকোনো শিল্পের যেমন নিজস্ব শৈলী ও প্রণালি রয়েছে, একজন ভালো শিল্পীকে সেই বিদ্যায় হাত পাকাতে হয়, শিক্ষাদানও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং অন্য যেকোনো শিল্পের তুলনায় এই বিদ্যায় দক্ষ হওয়া একটু বেশিই কষ্টসাধ্য বইকি। কারণ, সামান্য মাটির তৈজসপত্র থেকে সুরম্য অট্টালিকা চাইলেই ভেঙে নতুন করে গড়া গেলেও একটা জাতি ভুল শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিপথগামী হলে তার মাশুল দিতে হাজার

বছরও কম হয়ে যায়। এর অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান।

ভোগবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মতো কাপুরুষোচিত মানসিকতা আমাদের চিন্তার জগৎ থেকে জাতিকেন্দ্রিকতার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ফলে আমরা জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার পরিবর্তে নিজেকে নিয়ে এবং বর্তমান নিয়ে পড়ে থাকতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। অথচ একজন আত্মমর্যাদাবান ও ঐতিহ্যবাদী পুরুষের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু থাকে তার জাতি। আর তখনই সেই জাতির মধ্যে তৈরি হয় নেতা ও নেতৃত্ব।

আমরা যদি এই পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাই, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা থেকে বেরিয়ে জাতিকেন্দ্রিক ভাবনায় গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। অথচ এরমধ্যেই আমাদের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে দেশি ও বিদেশি 'শত্রুরা' আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যাচ্ছেতাই খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে রেখেছে। জাতির মেরুদণ্ডকে অকার্যকর করে দেওয়ার সকল বন্দোবস্ত প্রায় শেষ। এখনো যদি আমরা নিজেদের পথ নিজেরা না ভেবে পরিচিত পথেই চলতে থাকি, তবে জাতি-ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণ হতে আর কিছু বাকি থাকবে না।

আপনি যেকোনো ধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত যে-কেউ হন না কেন, শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উন্নত ও মানসম্পন্নভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজাতে এই বইটি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও বিজ্ঞ উপদেষ্টার মতোই আপনাকে সঙ্গ দেবে ইনশাআল্লাহ। দেশে প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদরাসা বা ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠার হার সবচেয়ে বেশি হলেও এর প্রায় ৯৫%-এর অবস্থান স্ট্যান্ডার্ড মানেরও অনেক নিচে। তাদের জন্য এই বইটি 'সোনার হরিণ' তুল্য বিবেচিত হবে আশা করি, যদি তারা গুরুত্বের সাথে নেন।

পরিশেষে বলি, বইটি যদি তার যথাযথ পাঠকের কাছে পৌঁছে, এবং তাদেরকে উপকৃত করতে পারে, তবেই লেখকসহ এর সাথে জড়িত সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন এর সাথে জড়িত সকলের শ্রম ও নিয়তকে কবুল করে নেন, এবং এই কাজকে আমাদের নাজাতের উসিলা বানান, আমিন।

বিনীত,

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

ডেমরা, ঢাকা

২৩/০৭/২০২৪

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, যিনি আমাকে শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি রচনার তাওফিক দিয়েছেন।

শিক্ষাকে কাঠামোবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার ফলে অ্যাকাডেমিক ধারা চালু হয়েছে। প্রত্যেক দেশ বা জাতি তাদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও তাদের চাহিদার আলোকে শিক্ষাকে উপস্থাপন করে থাকে। বিশ্বায়নের এই যুগে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতিক প্রভাব যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে, সেখানে সমাজের একটি অনুষঙ্গ হওয়ার ফলে শিক্ষা স্বভাবতই তার চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করছে।

ভৌগোলিক ও জাতিগতভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। যেখানে পুরো বিশ্ব জ্ঞান, দক্ষতা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে নানাভাবে তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, সেখানে আমরা পড়ে আছি কয়েক যুগ পেছনে। এই কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা যদি আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সমাজকে রক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য জাতির সাথে পাল্লা দিতে না পারে তবে চলমান অবস্থা হবে আরও ভয়াবহ। পরবর্তী প্রজন্ম মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহসটুকু অর্জন করতে পারবে না।

শিক্ষা এমন একটি মাধ্যম যাকে ব্যবহার করে ইচ্ছানুযায়ী কোনো প্রজন্ম তৈরি করা যায়। শিক্ষাকে যোগ্য, মানসম্পন্ন ও আধুনিকতর করতে প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট যেকোনো পর্যায়ের নেতা, যেমন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মাদরাসার মুহতামিম, ইসলামিক স্কুলের প্রধান, চাইল্ড বা বেবি কেয়ার পরিচালক, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষাগবেষক, শিক্ষা-উদ্যোক্তা, এনজিও কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিই পারেন আমাদের শিক্ষার হাল ধরতে। মূলত তাদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিদ্যমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, যেমন শিক্ষার বিভিন্ন পরিভাষা, কারিকুলাম, শিক্ষাপরিকল্পনা, শিক্ষায় নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠানব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, তত্ত্বাবধানসহ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, ও কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, দেশীয় শিক্ষার

ধরন ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে যুগোপযোগী ও টেকসই শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে বিশ্বমণ্ডলে তুলে ধরা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে শিক্ষাবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বীয় আলোচনা না টেনে বরং সহজবোধ্য ও সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রত্যেকটি অধ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে, যেন যেকোনো স্তরের পাঠক বইটি থেকে উপকৃত হতে পারেন। শিক্ষাবিজ্ঞানের একজন ক্ষুদ্র শিক্ষার্থী হিসেবে বইটিকে তথ্যসমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বেশ কিছু রেফারেন্সমূলক মাধ্যম থেকে সরাসরি সহায়তা নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, তরুণ লেখক হিসেবে কোথাও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে স্বাচ্ছন্দ্যে জানানোর অনুরোধ করছি, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ তৈরি হবে।

ফাওজুল কাবীর

fawzulkabir05@gmail.com

সূচি

প্রথম অধ্যায় : কিছু পরিভাষা/১৫

নিয়ত ১৬
ভিশন ১৮
মিশন ২০
লক্ষ্য ২২
উদ্দেশ্য ২৪
কৌশল ২৭
নীতি ২৯
পরিভাষার পার্থক্য ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় : কারিকুলাম/৩৩

যুগোপযোগী কারিকুলাম ৩৪
ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থী ৩৮
দেশীয় কারিকুলাম ৪১
স্টেকহোল্ডার ও প্রতিষ্ঠান ৪৭
কারিকুলামের উপাদান ৪৮

তৃতীয় অধ্যায় : কারিকুলাম ও শিক্ষার্থী/৫৯

প্রাক-প্রাথমিক ও শিশুযত্ন ৫৯
শিশুর বর্ধন, বিকাশ ও শিক্ষা ৬১
শিশুর মূল্যায়নপদ্ধতি ৬৫
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ৬৭
প্রতিবন্ধিতার ধরন ৬৯
শিখনে অক্ষমতার কারণ ৭০
শিক্ষায় মূল্যায়ন ৭২

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষায় পরিকল্পনা/৭৫

পরিকল্পনার প্রকারভেদ ৭৭
পরিকল্পনার ধাপ ৭৯
প্রোগ্রাম ও প্রজেক্ট ৮২
প্রোগ্রাম ৮৩
প্রজেক্ট ৮৩

পঞ্চম অধ্যায় : শিক্ষায় নেতৃত্ব/৮৫

নেতৃত্বের ধরন ৮৬
নেতার গুণাবলি ৮৮
নেতৃত্বে দক্ষতার উন্নয়ন ৮৯
নেতার বাহ্যিক চাপ ৯১

ষষ্ঠ অধ্যায় : শিক্ষায় ব্যবস্থাপনা/৯৩

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ৯৩
কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ৯৬
কৌশলগত ব্যবস্থাপনার মডেল ৯৭
PESTLE Analysis Model ৯৮
SWOT Analysis Model ১০১
সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা ১০৫

সপ্তম অধ্যায় : শিক্ষায় অর্থায়ন/১০৯

অর্থায়নের নীতি ১১০
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার ১১০

অষ্টম অধ্যায় : টিম ওয়ার্ক/১১৩

টিমওয়ার্কের ধাপসমূহ ১১৪
টিমওয়ার্কে নেতার করণীয় ১১৬

নবম অধ্যায় : প্রেষণা/১১৯

প্রেষণার গুরুত্ব ১২০

প্রেষণা বৃদ্ধির উপায় ১২১
প্রেষণার তত্ত্ব. ১২৩

দশম অধ্যায় : শিক্ষায় তত্ত্বাবধান/১২৭

তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা ১২৮
তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব. ১২৮
তত্ত্বাবধানে বাধাসমূহ. ১৩০

প্রথম অধ্যায়

কিছু পরিভাষা

একজন প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে হতে হয় দোধারি তলোয়ার। যেদিক দিয়ে প্রয়োজন সেদিক দিয়ে যেন কাটতে পারেন। অর্থাৎ জ্ঞানে, দক্ষতায়, প্রজ্ঞায়, বিচক্ষণতায় হতে হবে পরিপূর্ণ। রাখতে হবে নানা বিষয়ের ধারণা।

এজন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও শুরু করার পূর্বে কিছু পরিভাষা সম্পর্কে একান্ত ভালোভাবে জানা জরুরি। এসব শুধু গতানুগতিক আলোচনার জন্য উল্লেখ করছি না। আপনি এ বইয়ের যত ভেতরে প্রবেশ করবেন দেখবেন এই পরিভাষাগুলো জানা থাকা কতটা জরুরি। পরিভাষাগুলো জেনে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনামাফিক সাজালে ধীরে ধীরে একজন প্রধানের যে দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন হয় সেগুলো অর্জিত হবে।

ভিত্তি মজবুত করে তার ওপর ইট গেঁথে গেঁথে সুবিশাল প্রাসাদ বানাতে হবে। এটা একদিন বা দুদিনের কোনো কাজ নয় যে সহজে শিখে বাস্তবায়ন করে ফেলবেন। তাই আপনি এই পরিভাষাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়বেন। যখন যে বিষয়ে পড়বেন সাথে সাথে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্যও পরিভাষার আলোকে খসড়া নিয়মকানুন তৈরি করবেন। এতে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগানো সহজ হবে।

ধরা যাক, আপনি এই মুহূর্তে 'লক্ষ্য' অনুচ্ছেদটি পড়ছেন। তাহলে খুব জরুরি হলো আপনি খাতা-কলম নিয়ে সাথে সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি খসড়া লক্ষ্য তৈরি করবেন। এভাবে প্রত্যেকটি পরিভাষা যদি বুঝে বুঝে সে অনুযায়ী আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য সুন্দর একটি ম্যাপ তৈরি করে নিতে পারেন, তাহলে

দেখবেন বইটি পড়া শেষে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে। একটি গোছানো ও কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি অন্যদের থেকে আপনাকে যুগ যুগ এগিয়ে রাখবে।

এজন্য পরিভাষাগুলো খুব ভালোভাবে রপ্ত করুন। যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করুন। দেখবেন শিক্ষা, দীক্ষা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনে প্রতিষ্ঠান নিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন, ইনশাআল্লাহ।

নিয়ত

কোনো কাজের প্রতি সংকল্প করাকে আরবিতে নিয়ত বলে। ইসলামে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। সংকল্প বা নিয়ত করতে হয় একনিষ্ঠ মনে। যাকে বলে বিশুদ্ধ নিয়ত।

আমরা মনে করি সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি ইসলামি কাজের পূর্বে সংকল্প বা নিয়ত করতে হয়। আর আমাদের জৈবিক চাহিদা, দৈনন্দিন লেনদেন, কথাবার্তা, দেখাসাক্ষাৎ, হাটবাজার ইত্যাদি যেহেতু নিখাদ দুনিয়াবি কাজ, তাই এসবে নিয়তের প্রয়োজন নেই। না, এটা আমাদের আগাগোড়া একটা ভুল ধারণা।

যেকোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করলেই তাতে বিশুদ্ধ নিয়ত করা উচিত। কোনো কাজের শুরুতে যদি নিয়ত বিশুদ্ধ হয়, হোক না সেটা যেকোনো বৈধ কাজ, তার প্রতিদান আমরা আল্লাহর কাছ থেকে পাব, ইনশাআল্লাহ। নিয়ত যদি সহিহ হয়, তাহলে নামাজ আদায় করে যেমন সওয়াব পাওয়া যাবে, তেমনই মানুষের উদ্দেশে জ্ঞান বিতরণ করার ব্যবস্থা করলেও সওয়াব অর্জিত হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু গুটি কয়েক আমলের জন্য নিয়ত করতে হবে, এটা নিছক একটা ভুল ধারণা।

আমাদের যাপিত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কাজে থাকা চাই বিশুদ্ধ নিয়ত। মানুষের জ্ঞান অর্জনের পথ খুলে দেওয়া বা ব্যবস্থা করা অত্যন্ত মহৎ কাজ বলে ইসলামে বিবেচিত। যেমন,

> ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'তোমরা রব্বানি হও।' রব্বানি অর্থ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানবান।[১]

যারা মানুষের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হন, অপরের জ্ঞানার্জনের পথ খুলে দেন, তারা হয়তো অনুভব করতে পারেন না যে তারা কত বড় মহৎ কাজ করছেন। এভাবে তারা মানুষের জ্ঞানার্জনের পথ তৈরি করে অনবরত সওয়াব পেতে থাকেন। এর

[১] বুখারি, ইলম, ৫২

হিসাব তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। জ্ঞান শেখার ব্যবস্থা করে দিলে এর সওয়াবের ধারাবাহিকতা মৃত্যুর পর পর্যন্ত চলতেই থাকে। যেমন হাদিসে আছে,

> হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার আমলের (সওয়াবের) ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. এমন ইলম যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। ৩. এমন সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।[২]

জ্ঞানার্জনের কথা বললে কোনো এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। একটা আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শত শত, হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের ধারকবাহক বানিয়ে বিদায় দেয়। আর আপনি যদি হন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, তাহলে আপনি নিজের জন্য কত বড় উপকার করছেন একবার ভেবে নিন। তা ছাড়াও একটা ভালো প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা যখন নানা ক্ষেত্রে তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়াবে তখন নাম হবে আপনার, আপনার প্রতিষ্ঠানের।

কোনো কাজের শুরুতে নিয়ত করা জরুরি। তাহলে ওই কাজের সফলতা অর্জিত হয়। খেয়াল করে দেখুন, আপনি শুধু নিয়ত করলেন, তার বিনিময়ে সওয়াব পেলেন একবার। ভালো কাজটি করলেন, সওয়াব পেলেন আরেকবার। তার মানে, যদি বিশুদ্ধ নিয়তে কাজটা করে ফেলেন তাহলে দুইবারের সওয়াব একসাথে পেলেন আপনি। একবার নিয়ত করার কারণে, আরেকবার জ্ঞান অর্জনে কাউকে কোনোভাবে সহযোগিতা করার জন্য। এই জ্ঞান যদি উপকারী জ্ঞানের সাথে মিশে যায় আর সে ধারাবাহিকতা যদি কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকে, তবে আপনি ননস্টপ সওয়াব পেতেই থাকবেন, ইনশাআল্লাহ। এর চেয়ে আর বুদ্ধিমানের কাজ কী হতে পারে!

এজন্য প্রতিষ্ঠান শুরু করার পূর্বে অথবা কোনো কাজ আঞ্জাম দিতে বিশুদ্ধ নিয়ত করতে হবে। বাজে কোনো উদ্দেশ্য থাকলে সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নিয়ত অসৎ হলে ভালো কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না। উপরন্তু নিজের ও সমাজের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। যদি নিয়ত পরিশুদ্ধ হয় তাহলে তো সওয়াব পাওয়াই যাবে। এই সওয়াবের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে, দুনিয়াবি উপকার লাভ হবে, আর্থিক সুবিধা আসবে, প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ইমপ্রেশন তৈরি হবে।

---

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩১০

নিয়ত সম্পর্কে বুখারি-র প্রথম হাদিসটা তো অনেক বিখ্যাত। যেমন,

> হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার নিয়ত সে করবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্যই হবে। আর যে দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত ওই বিষয়ের জন্যই হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছিল।[৩]

হাদিসটাতে খেয়াল করলে দেখবেন যে, নিয়ত যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হবে সে কাজ সে হিসেবে গণ্য হবে। যদি নিয়ত সৎ হয় তবে সে কাজে ফায়দা হবে সুদূরপ্রসারী, যেমনটা আমরা একটু আগে জানতে পারলাম। আর নিয়ত যদি হয় নিছক কোনো কাজের জন্য, তবে তার ফায়দা হবে অত্যন্ত সীমিত।

এভাবে চিন্তা করে কেউ যদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুরু করে এবং তার নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেয়, তবে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার প্রতিষ্ঠান কবুল করবেন।

সর্বোপরি বিশুদ্ধ নিয়তের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য এখনই আপনি নিয়তকে সহিহ করে নিন আর কাজে নেমে পড়ুন।

ভিশন

ভিশন ইংরেজি শব্দ, যার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় রূপকল্প হিসেবে। তবে ইংরেজি ভিশন আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। যখন আপনি একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে চান, তখন আপনার নিয়ত থাকে মহৎ কিছু করার। আপনার মনে উঁকি দেয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাদীক্ষায় হবে অনুসরণীয়। বাঘা বাঘা শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশকে করা হবে উন্নত। অত্যাধুনিক ফ্যাসিলিটিজ থাকবে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে। মানে-গুণে একটা কারিকুলাম থাকবে যার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হবে। অ্যালামনাই শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিষয়ে দেশকে ছাপিয়ে বিশ্বে মাথা উঁচু করে ধরবে। আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম মানুষের মুখে মুখে থাকবে। এমন আরও নানা মহৎ উদ্যোগ হয়তো আপনার কল্পনারাজ্যে বসবাস করছে।

মানুষ যেহেতু তার কল্পনার সমান বড় তাই কোনোকিছুই আসলে অসম্ভব নয়।

[৩] বুখারি, হাদিস, ১; মুসলিম, হাদিস, ১৯০৭

এভাবে প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের মতো করে স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নকে মনে সযত্নে লালন করি। কাজের সময় চিন্তা করি এ কাজটা হয়তো এভাবে করলে ভালো হবে। এখানে অমুক লোককে দিয়ে কাজ হবে। ওই কাজটা খুব মানসম্মত করে করতে হবে। এভাবে করলে ব্যয় কম হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হবে। এমন আরও নানা ধরনের চিন্তাভাবনা মনে উঁকি দিতে থাকে।

এভাবে ভাবলে, চিন্তা করলে আপনার মনে কাজ করার একটা অদম্য স্পৃহা জেগে ওঠে। আপনার মনে হয় আপনি পারবেন। শত বাঁধা, বিপত্তি, দুর্বলতা আপনাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। অনেকেই এমন স্বাপ্নিক প্রতিষ্ঠান বাস্তবিক রূপ দিতে পারলে আপনিও তাদের থেকে কোনো অংশে কম নন।

কাজ করার তীব্র এই আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় ভিশন। সুতরাং,

> প্রতিষ্ঠান শুরু করার স্বপ্ন দেখার মহৎ ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা ও পরিকল্পনা করার অদম্য স্পৃহাকে ভিশন বলে।

শুধু মনের কোণে একটুকরো আশা নিয়ে বসে থাকলে তাকে ভিশন বলা হয় না। আমরা জীবনে কত শত যে আশা করি। ইশ! যদি এটা হতো, ইশ! যদি ওই জিনিসটা পেতাম। এসব কিন্তু ভিশন নয়। আমরা বলেছি, যে আশা আপনাকে কাজের স্পৃহা তৈরি করে দেয় না, সেটা মোটেও ভিশন নয়। ভিশন তৈরি হয়ে গেলে আপনি ছোটাছুটি করবেন, তীব্রতা অনুভব করবেন, যতক্ষণ না কাজটা শেষ করেছেন স্থির থাকতে পারবেন না। এমন উচ্চমার্গীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাই ভিশন বলে বিবেচিত হবে। এর পেছনে গভীর চিন্তা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার আকাঙ্ক্ষা আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে। যারা একবার ভিশনে নামেন তারা এর ফলাফল না নিয়ে ক্ষান্ত হন না।

মনে দীর্ঘদিনের লালন করা স্বপ্নকে সুদূরপ্রসারী বাস্তবায়নে সর্বদা তৎপর থাকেন। আপনি যদি একজন সত্যিকারের উদ্যোক্তা হয়ে থাকেন তবে আপনার স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও পরিকল্পনা বাস্তবে প্রতিফলিত হবেই। এটাই হবে আপনার ভিশন।

এই মুহূর্তে আপনার উচিত হলো আপনার এই মহৎ ভিশনকে কাঠামোয় আবদ্ধ করা। কাঠামোবদ্ধ কাজ আপনাকে ঝামেলামুক্ত পথ তৈরি করে দেবে। তাই আপনি চাইলে খাতা-কলমে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা মহৎ ভিশন তৈরি করে নিতে পারেন। আবার মনে মনেও ভেবে নিতে পারেন। তবে উত্তম হলো আপনি কাজের দলিল রাখুন। তাহলে কাজের সাথে সাথে ভিশনকে মিলিয়ে নিতে সুবিধা হবে। তবে মনে রাখতে হবে ভিশন হতে হবে স্পষ্ট, চমৎকার ও আকর্ষণীয়।

ধরা যাক, আপনি প্রতিষ্ঠানকে করতে চান অন্যতম একটি সেরা প্রতিষ্ঠান। যেখানে শিক্ষার্থীরা উন্নতমানের শিক্ষা পাবে। খ্যাতিমান শিক্ষকদের থেকে শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও ধার্মিকতায় মন ছুঁয়ে যাবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাম লেখাবে। এভাবে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে ভিশন সাজাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের ভিশন যেন অতি দীর্ঘ না হয়ে যায়। ভালো হয় যদি এককথায় বা একবাক্যে ভিশনকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। যেমন, কোনো স্কুলের ভিশন হতে পারে,

> শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিশ্বখ্যাত স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

তবে মনে রাখতে হবে যে, ভিশন সাধারণত এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যার অর্জনে চলতে থাকে অবিরাম শ্রম, সাধনা ও প্রচেষ্টা।

আশা করি এতক্ষণে আপনিও একটা সুন্দর ভিশন তৈরি করে ফেলেছেন। এখন পরম যত্নে আপনার ওই ভিশনকে কাগজে-কলমে মিলিত করুন।

মিশন

সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে গেলে তার পেছনে অব্যাহত কাজ করে যেতে হয়। যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠানের শুরুর দিকে নানা রকমের কাজ থাকে, তাই একজন উদ্যোক্তা শুরুতেই হাঁপিয়ে ওঠেন এসব কাজ করতে করতে। একদিকে শিক্ষার্থী সংগ্রহ, অন্যদিকে অবকাঠামোর চাহিদা, শিক্ষক নিয়োগ, আবার কখনোবা অভিভাবককে বোঝানো। এভাবেই চলতে থাকে নানা চাপ আর চাপ। আবার স্বপ্নের ভিশনকে বাস্তবায়ন করতে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হয়। এজন্য কাজের সুবিধার জন্য তৈরি করে নিতে হয় মিশন।

ভিশনকে ব্যাখ্যা করার হাতিয়ার হলো মিশন। ভিশনে থাকে বড় বড় বিষয়। সেগুলো তো আর রাতারাতি অর্জন করা যায় না। ভিশনের কোনো একটি অংশকে বাস্তবায়নের জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে হয়। এই পদক্ষেপগুলো ধীরে ধীরে পূরণ করে করে যেতে হয়। একসময় মিশনগুলো সম্পন্ন করা হলে ভিশনের একটা অংশ অর্জিত হয়। যেমন ধরা যাক, শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে বলে ভিশনে আছে। সমস্যা হলো শিক্ষার্থীরা বাসা থেকে নৈতিকতা পূর্ণরূপে শিখে আসে না। এজন্য প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নিল যে, বইয়ে সিলেবাস আকারে নৈতিকতার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা হবে। আবার শিক্ষার্থীদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে নৈতিকতার দীক্ষা দেওয়া হবে। এভাবে

গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগকে বলা হবে মিশন।

নৈতিকতার মিশন সাকসেস হলে ভিশনের একটি অংশ পূরণ হবে। নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সমাজে নাম করবে। মানুষ জানবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ভালো। সাধারণ মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি মিশনের মাধ্যমে সমাজের মানুষ জানতে পারবে আপনার প্রতিষ্ঠান কী কী করছে। কীভাবে আপনার প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতা ফুটে উঠবে। সমাজের মানুষের কাছে পজিটিভ ধারণা জন্মাবে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুকূল মনোভাব তৈরি হবে। তখন মানুষ সন্তানকে ভর্তির ব্যাপারে বিবেচনা করবে। এভাবে একসময় প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তৈরি হয়।

মিশনকে আপনি প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিংয়ের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। সমাজে তুলে ধরতে হবে আপনার প্রতিষ্ঠান কেন ভালো, কী কী সুবিধা আপনি সরবরাহ করেন, প্রতিষ্ঠানের কেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, শিক্ষণ-শিখনের জন্য বিশেষ কী কী ব্যবস্থা রয়েছে, অ্যালামনাই শিক্ষার্থীরা পাশ করে কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে ইত্যাদি। খেয়াল করে দেখুন, আপনি মিশনের এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে ভিশনের কিছু কিছু অংশ বাস্তবায়ন করতে পারছেন। অতএব আমরা বলতে পারি,

> মিশন হলো কোনো কাজের এমন একটি বিবৃতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার কাজের পরিধি, গুণাগুণ, স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে সমাজে তার অবস্থান সম্পর্কে জানান দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রতিষ্ঠানের মিশন হতে পারে,

- ইসলামের জ্ঞান ধারণ ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার দীক্ষা দেওয়া।
- প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে নৈতিকতাকে উপস্থাপনের মাধ্যমে চর্চা করা।
- শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশে শিক্ষকদের সহযোগিতায় নৈতিকতার চর্চায় উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

আপনি এতক্ষণে মিশনের মেকানিজম বুঝে ফেলেছেন আশা করি। কোনো কাজকে খণ্ড করে আদায় করার কৌশল হলো মিশন। ভিশনে উল্লেখিত মিশনগুলোকে ধরে ধরে কীভাবে মিশন সাকসেসফুল করার কাজ হাতে নেবেন তার একটা তালিকা তৈরি করতে পারেন।

লক্ষ্য

বলা হয়ে থাকে, সময় গেলে সাধন হবে না। লক্ষ্যবিহীন কাজও সাধন হয় না। যে প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আপনি বুকে আগলে রেখেছেন, তার জন্য একটা লক্ষ্য তৈরি করেছেন কি? এ ব্যাপারে কখনো নিবিষ্ট মনে চিন্তাভাবনা করেছেন? কীভাবে আপনি প্রতিষ্ঠান নিয়ে সামনে অগ্রসর হবেন, কোন কোন কাজ আপনাকে করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন একটি উদ্দেশ্যমুখী স্পষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা মনে করি কোনোকিছু চাওয়াকে লক্ষ্য বলে, তা কিন্তু নয়। লক্ষ্য কী সেটা আগে বুঝতে হবে। যদি বলি এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপনি কোথায় পৌঁছতে চান, বুকে আগলে রাখা প্রতিটি আবেগ দিয়ে কী করতে চান, একটা সময় পর প্রতিষ্ঠানের রূপ কেমন হবে তার বর্ণনা দিন, তবে পারবেন এসব প্রশ্নের সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে? আপনার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান দেখতে কেমন লাগছে, শিক্ষার্থীরা পাস করে কোথায় কোথায় কর্মে নিযুক্ত আছে, বলতে পারবেন তো?

আপনাকে এখন থেকে আগামী পুরো ১০ বছর দেখতে হবে। ওই সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া প্রত্যেকটি ফুলের কলিকে চিনতে হবে। তাদের স্বভাব, অবস্থা, চিন্তা করার পরিধি, চাহিদা এখন থেকে দেখতে পারার এক অসীম যোগ্যতা আপনার ভেতর সৃষ্টি করতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম, কাঠামো, আবাসন, অ্যাকাডেমিক ভবন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে হবে। শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের অপুষ্টতা থেকে নিজের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে ফেলছে, বা শারীরিক কোনো ত্রুটির কারণে তাদের শিখনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, এজন্য প্রতিরোধমূলক কী ব্যবস্থা আপনার হাতে রয়েছে? আপনি কি এসব বিষয় এখন থেকেই দেখতে পান?

মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকা শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলোর একটা। সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠা, কোনো হেনস্থার শিকার না হওয়ার প্রতি যত্ন নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য কী কী ব্যবস্থা আপনার আছে? নাকি শুধু শখ করে প্রতিষ্ঠান দেওয়ার কথা চিন্তা করেছেন, অথবা পেটের দায়ে প্রতিষ্ঠানকে ইনকামের ধান্ধা হিসেবে বেছে নিয়েছেন?

একটা সত্যি কথা বলি। যদিও কথাটা আপনার অন্তরে তীব্র আঘাত আনতে পারে, তবুও বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে। বর্তমানে অযাচিত গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মূলত এর প্রতিষ্ঠাতাদের বেকারত্ব ঘুচানোর মোক্ষম হাতিয়ার। আমি বলছি না এর মাধ্যমে পেটের ব্যবস্থা করা কিংবা বেকারত্ব ঘুচানো অন্যায়। বরং সমস্যা হলো প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনার জন্য যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা

দরকার তা অর্জন না করেই তারা কেবলই উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে এ পথ বেছে নেন। যে বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতার পুঁজি নেই, যেখানে আমি একজন আনকোরা ব্যক্তি, সেখানে কোন সাহসে ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদের ভবিষ্যৎ শঙ্কায় ফেলার দুঃসাহস দেখাতে পারি?

আমরা বলি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যেখানে আপন মেরুদণ্ডের হদিস নেই, সেখানে সমাজের, জাতির মেরুদণ্ড নিয়ে খেলা করছি। মাঝে মাঝে আবার মজাও করছি যে, এখন যেহেতু প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর পড়ালেখা হয় না, তাই এই সুযোগে ভাগ্যের একটা ট্রায়াল দিই। খেয়াল করে দেখুন, সব দোষের মূলে কিন্তু আপনি-আমি। নিজের অযোগ্যতা ঢাকতে প্রতিষ্ঠানের ছায়ায় আশ্রয় নিলাম, কিন্তু আমার কলস খালি।

আপনার সন্তান সমাজ সম্পর্কে কী জানতে পারবে, সমাজে তার কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, এসব জানার কোনো ব্যবস্থা আপনি রেখেছেন? কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিকীকরণ করা হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই আমি প্রতিষ্ঠান শুরু করছি। এই ছেলেখেলা একদম অনুচিত।

আমাদের ধারণা যদি এমন হয় যে, যা আছে তাই পড়াব, যেভাবে চলছে সেভাবেই চালাব, বাকি তেমন কিছু আর লাগবে না, তাহলে আপনার এখুনি থামা উচিত। মনে রাখুন ভাই, প্রত্যেকটা শিশুকে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, জ্ঞানগত ও সামাজিকভাবে বিকাশের দায়িত্ব নিতে না পারলে প্রতিষ্ঠান দেওয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। কমপক্ষে এ পাঁচটি ডোমেইন মুখস্থ রাখুন। প্রত্যেকটা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করুন। যখন শিক্ষার্থীর এসব খোরাক দেওয়ার মতো সামর্থ্য তৈরি হবে তখনই প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতে পারেন।

যদি আপনি নিজের দক্ষতা-যোগ্যতা আরও বাড়াতে চান, তবে সামনে পড়তে থাকুন। আপনার সঠিক দিশা পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ। আপনার দুর্বলতা কাটিয়ে আপনি হয়ে উঠবেন একজন আদর্শ প্রতিষ্ঠানপ্রধান।

ওপরের আলোচনাগুলোর সারমর্ম মাথায় রাখুন, এরপর আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা রূপরেখা তৈরি করুন। যেখানে উল্লেখ থাকবে কোন কোন ক্ষেত্র নিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠান কাজ করবে। সবগুলো একত্র করে একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করুন, যেন একসাথে সব বিষয়ের সারাংশ উঠে আসে। আপনি হয়তো একদিনে সব লিখতে পারবেন না, এজন্য সময়ের দরকার। গভীর চিন্তাভাবনা করে, পড়াশোনা করে, দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে, দক্ষ ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়।

আপনি যদি একটি লক্ষ্য ইতিমধ্যে লিখে ফেলে থাকেন, তবে আপনাকে অভিনন্দন। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্য তৈরি করার মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ একধাপ এগিয়ে গেলেন। এখন আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে আরও জানা প্রয়োজন। সুতরাং লক্ষ্যের সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি যে,

> লক্ষ্য হলো বিস্তৃত ও জটিল ভাষায় প্রকাশিত এমন একটি বিবৃতি যার প্রতিফলন ঘটে বিমূর্ত ধারা ও দার্শনিক চেতনায়।

লক্ষ্যের সংজ্ঞা আপনার কাছে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। আসলে লক্ষ্য জিনিসটাই কঠিন। কারণ এটা বিমূর্ত ব্যাপার। লক্ষ্যকে ধরা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। এটাতে দর্শন দর্শন একটা ভাব থাকে। এটা হবে বিস্তৃত ও জটিল ভাষায় প্রকাশিত একটা বিবৃতি। যেমন, শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিকাশ লাভ করবে। তাহলে দেখুন মানসিকভাবে বিকাশ লাভ করা কিন্তু ছোটখাটো কোনো বিষয় নয়। এতগুলো শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঠিকভাবে পরিচর্যা হচ্ছে কি না এটা নিয়ে কাজ করা, এর ফলাফল বের করে আনা আসলেই বিস্তৃত ও জটিল বিষয়। কিন্তু যত কঠিনই হোক লক্ষ্য তো স্থির করতেই হবে। কারণ লক্ষ্য নির্ধারণ ছাড়া কাজ করা যায় না।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেকোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। এ কারণে এটাকে বিমূর্ত বলা হয়। আবার লক্ষ্য হবে স্পষ্ট ভাষায় যা পড়েই বুঝতে পারা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যটা দেখুন,

> শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

এরকম একটা প্যাকেজের সমন্বয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য তৈরি করতে হবে।

উদ্দেশ্য

লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার পর এবার আমরা জানব উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ওপরে বর্ণিত লক্ষ্য পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছিলাম যে, শিক্ষার্থীরা জ্ঞানক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জন করবে। এবার আসুন আমরা জানি জ্ঞানক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য অনেকগুলো ক্লাস থাকে। প্রত্যেকটা ক্লাসেই কিছু কিছু বিষয় পাঠদান করা হয়। যেমন, ভাষা, ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি। আবার ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরও অনেক বিষয়। এই যে আমরা ভাষা নিয়ে পাঠদান করি, ধর্ম নিয়ে পাঠদান করি, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে পাঠদান করি, এগুলো একেকটা জ্ঞানক্ষেত্র।

লক্ষ্য নিয়ে আলোচনায় সময় আমরা জ্ঞানক্ষেত্র নিয়ে কথা বলছিলাম, কিন্তু এখন এই জ্ঞানক্ষেত্রকে আরেকটু বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করলাম। অর্থাৎ জ্ঞানক্ষেত্র যদি লক্ষ্য হয়, তবে এর বিভিন্ন বিষয়কে আমরা উদ্দেশ্যে বলব। সহজ কথায় লক্ষ্যকে ভাঙলে আমরা পাই উদ্দেশ্য। আমরা যদি বলি 'জ্ঞানক্ষেত্র', তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় কোন জ্ঞানক্ষেত্র। কিন্তু যদি বলি 'বাংলা', তবে আমরা সহজে বুঝি যে বাংলা ভাষার কথা বলা হচ্ছে। এভাবে লক্ষ্যকে ভাঙলে আমরা পাই উদ্দেশ্য।

এজন্য বলা হয় লক্ষ্য হয় জটিল ও বিমূর্ত আর উদ্দেশ্য হয় মূর্ত। লক্ষ্যকে একবারে অর্জন করা যায় না, কিন্তু উদ্দেশ্যকে অর্জন করা যায়। এজন্য আমাদেরকে কোনো কাজ অর্জন করতে হলে উদ্দেশ্যভিত্তিক ধারায় অর্জন করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, লক্ষ্যের একটা অংশ একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, কারণ ওই লক্ষ্য আদায় করতে হলে অনেকগুলো কাজ হাতে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য লক্ষ্য হয় একটা, কিন্তু উদ্দেশ্য হয় অনেক। সুতরাং,

> উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্যের ওই অংশ যা একটি প্রতিষ্ঠান তার কাজের মাধ্যমে অর্জন করে।

জাতীয় কারিকুলামের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য একটা, কিন্তু উদ্দেশ্য ১৩টা। আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য যে লক্ষ্য তৈরি করেছেন সেটাকে অর্জন করতে এখন আপনাকে কিছু উদ্দেশ্য তৈরি করতে হবে। সেগুলো ধাপে ধাপে অর্জন করার মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থান আরও উচ্চে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্যগুলো সাজিয়ে নিন, যেন সহজেই সে উদ্দেশ্যগুলোকে ধরে ধরে কাজ করে যেতে পারেন।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পেতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো দেখুন। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১. সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২. শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাবোধের উন্মেষে সহায়তা করা।

৩. বিজ্ঞানের নীতিপদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৪. ভাষা ও যোগাযোগদক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।